পলাতক

শেষ রুগীটার প্রেসক্রিপ্শন লিখে গতানুগতিক উপদেশ-নির্দেশ ও অভয় বাক্যে লোকটাকে বিদায় করে চোখ থেকে চশমা খুলে ভাঁজ করে টেবিলের উপর রাখলেন ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ। তারপর ক্লান্ত শরীরটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক দৃষ্টি চালিয়ে দিলেন জানলার বাইরে।

ওঁর চেম্বারের ঠিক উল্টো দিকে, রাস্তার ওপাশে একটা ছোট একতলা হলদে রঙের বাড়ি। বাড়ির সামনে কৌতূহলী দর্শকের জটলা। গৃহকর্তা বিনীত-বিপন্ন হাসি মুখে ব্যস্তভাবে হাত নেড়ে কাকে কি যেন বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তবে খুব সুবিধে করতে পারছেন বলে মনে হয় না। কারণ তাঁর অনুনয়ের পাত্র ---- সস্তা ঝলমলে শাড়ি পরা বিচিত্র মানুষটির চোখেমুখের কাঠিন্যে বিন্দুমাত্র হেরফের দেখতে পেলেন না নগেন্দ্রনাথ। দরজার সামনে উৎকট বেশভূষাধারী আরও চার পাঁচটি প্রাণী ঢোলকের আওয়াজের সঙ্গে কুৎসিত্ অঙ্গভঙ্গি করে কর্কশ কণ্ঠে গান করছে,

"মেরী রেশমী শাড়ি উড় উড় যায়
মেরি রেশমী শাড়ি খুল খুল যায়
ও জী ও জী -------"

এই মুহূর্তে দৃশ্যটার কুৎসিত্ অশ্লীল দিকটা ডাক্তার নগেন্দ্রনাথের চোখে পড়লো না। তিনি অনিমেষ দৃষ্টিতে হলদে বাড়ির গৃহকর্তা রাঘবনের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। রাঘবন তাঁর বহু পুরোনো রুগী। বছর আষ্টেক আগে এ পাড়ায় জমি কিনে বাড়ির পত্তন করার পর নগেন্দ্রনাথকেই পারিবারিক চিকিৎসক পাকড়েছিলেন এবং এতবছরের আনাগোনার ফলে হৃদ্যতা না হ'লেও একটা খোলামেলা ভাব এসে পড়েছে তাঁর ব্যবহারে। নাপিতের দোকানের মত ডাক্তারের চেম্বারে

বসলেও মানুষের মনের অবরোধ সরে যায় কোনও অজ্ঞাত কারণে। অনেক সময় চাপা লোকেরাও নাপিত ও ডাক্তারের কাছে অক্লেশে তাঁদের মনের আগল খুলে ফেলেন। ফলে ব্যক্তিগত কৌতুহল থাক বা না থাক, নরসুন্দরের মত চিকিৎসককেও পাঁচজনের হাঁড়ির খবর শুনে যেতে হয় ধৈর্য সহকারে। এইভাবে রাঘবন পরিবারের অবস্থাও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জেনেছেন নগেন্দ্রনাথ।

কিভাবে বাড়ি-ভাড়ার টাকায় বড়লোক হ'বার স্বপ্ন দেখে এই নিম্নমধ্যবিত্ত লোকটি নিজের সাধ্যাতিরিক্ত খরচা করে হাল ফ্যাসানের বাড়ি ফাঁদেন এবং আজীবনের সঞ্চয়ের তলদেশ স্পর্শ করে সে বাড়ি অর্ধপথেই ফেঁসে যায় এবং শেষ অবধি চড়াহারের ধারের টাকায় (আদি প্ল্যানে অনেক কাট-ছাঁট করে এবং সম্পূর্ণ দোতলাটাকে বাদ দিয়ে) কষ্টেসৃষ্টে বাড়িখানা খাড়া করেও শেষরক্ষা হয় না অর্থাৎ মায়া-বন-বিহারিণী ভাড়াটের পদার্পণ ঘটে না। পরিবর্তে রাঘবন স্বয়ং সেখানে বসবাস করতে বাধ্য হন এবং নিজের এবং পরিবারের পেট কেটেও বহু বছর ধরে ঋণের বোঝা বহন করেন।

ইতিমধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যাটিকে পাত্রস্থ করতে আরেক দফা মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয় তাঁকে। সেই কন্যাই সম্প্রতি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। গতকাল যথাবিধি নাতির কল্যাণ কামনায় পুজোআচ্চাও হয়ে গেছে বেশ ঘটাপটা করেই এবং সে খরচখরচাও যে ঐ ঋণের টাকা থেকেই সেটা ভালভাবেই জানেন নগেন্দ্রনাথ। আজকের এই নৃত্য-গীত-বাদ্যের আচম্‌কা আক্রমণ ও আনুষঙ্গিক দাবী দাওয়া একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভদ্রলোকের কাছে। তবুও মানুষটাকে বিনীত হাসিমুখে অপর তরফের কাছে তাদের চাহিদার অঙ্ক কমানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য, এত সমস্যা নিয়েও হাসতে পারে মানুষ ! পারে হাসিমুখে বেঁচে থাকতে !

রাঘবনের তুলনায় তাঁর নিজের জীবন তো কুসুমশয়ন বলতে গেলে। তিরিশ বছরের প্র্যাকটিসে বাড়ি-গাড়ি-মেয়েরবিয়ে-ছেলের পড়াশোনা, সবরকম করণীয় কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করার পরেও মোটা অঙ্ক জমাতে পেরেছেন ব্যাঙ্কে। এখনও যে চেম্বারে বসেন সেটা খানিকটা অভ্যাসবশে, খানিকটা জনহিতায়। সেই সঙ্গে নিজের হিতও অবশ্য হয়

তবে সেটা আর মুখ্য নয় এখন, অন্তত তিনি সেটাকে মুখ্য মনে করেন না বলেই বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করে তৃপ্তি পান মনে মনে। কিন্তু তবু রাঘবনের মত মুখে হাসি টেনে আনতে পারেন কই? অথচ ছোটবেলায়, এমন কি প্রথম যৌবনেও আমোদপ্রিয় বলে নাম ছিল তাঁর। স্কুল-কলেজে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে মধ্যমণি ছিলেন সতত। তখনকার বন্ধাহীন দিনগুলো মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত আবছা মনে পরে আজও।

ক্রিং ---- ক্রিং ---- ক্রিং ----।

রিসিভার কানে লাগাতেই অর্ধাঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর কানে আসে, "পাব্দা মাছ আর কেকের কথা ভোলোনি তো?"

নগেন্দ্রনাথ জিভ কেটে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "এই যে, এক্ষুণি যাচ্ছি ----।"

অপর প্রান্ত কঁকিয়ে উঠলো, "ওমা সে কি গো? সকালে বলে আসোনি? আর পেয়েছ তবে। তোমার পাব্দা মাছ বসে আছে এখনও। আর ম্যাক্সিমও বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমারও যেমন মরণ হয় না ----।"

ও তরফের রিসিভারের আর্তনাদ কানে আসে। স্তব্ধ হয়ে বসে পড়েন নগেন্দ্রনাথ। সকালে রাসেল মার্কেটে ওঁদের বাঁধা মাছওলাকে পাব্দা মাছের জন্যে বলে আসতে ভুল হয়ে গেছে। ম্যাক্সিমে কালকের জন্যে কেকের অর্ডার দিতেও বেমালুম ভুলে গেছেন। আসলে কাল যে ওঁর বিবাহ বার্ষিকী সে কথাটাই মন থেকে উপে গেছিল তাঁর। শুধু বিবাহ বার্ষিকী নয়, পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিকী অর্থাৎ যাকে বলে কিনা রজত জয়ন্তী। কাল দুপুরে বাছাবাছা বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা গণ্যমান্য ব্যক্তি, অনেকজনকে নিমন্ত্রণ করেছেন সুনন্দা।

সকালে একটা ধার্মিক অনুষ্ঠান হ'বে এবং তারপর পার্টি। জোগাড় যন্তর প্রচুর হয়েছে এবং সব কিছু বলতে গেলে সুনন্দা একা হাতেই করেছেন। নিজের জন্যে শাড়ি-গয়না বাছাই করা, কেনা। স্বামীর স্যুটের অর্ডার দেওয়া। কেটারিংএর ব্যবস্থা। শেষমুহূর্তে নেহাত অপারগ হয়ে ছোট দু'টি কাজ নগেন্দ্রনাথকে সঁপেছিলেন ---- ম্যাক্সিমে একটা বড় কেকের ফরমাস দেওয়া যার উপরে চকোলেট-ক্রীমের হরফে লেখা থাকবে 'মেনি হ্যাপি রিটার্নস্ অফ দ্য ডে' এবং পাবদা মাছ। দ্বিতীয়টা

অবশ্য পার্টির জন্যে নয়, মুখ্যত স্বামীর জন্যেই।

একদা নগেন্দ্রনাথ পাবদা মাছের ভক্ত ছিলেন একথা জানতে পেরে অবধি বিশেষ বিশেষ তিথি পার্বণে যে করেই হোক পাবদা মাছ সংগ্রহ করেন সুনন্দা, এবং সেই মাছ নিজে হাতে কুটে রেঁধে স্বামীকে পরিবেশন করেন। সুতরাং আগামীকালের উৎসবে মস্‌মসে কাঞ্জিভরম শাড়ি পরে নতুন স্টীলের প্লেটে সোনালী-বাদামী ঝোল-মশলা মেখে পাশাপাশি শুয়ে থাকা পাবদা মাছের নৈবেদ্য হাতে গৃহিনীর পতিপরায়ণা অন্নপূর্ণার যে ভূমিকা অবধারিত ছিল হঠাৎ তার থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনায় তিনি যে মনক্ষুন্ন হ'বেন সেটা স্বাভাবিক কিন্তু নগেন্দ্রনাথের এখন সে সব বিচার করে পত্নির প্রতি সহানুভূতিশীল হ'বার অনুকূল মনোভাব নয় মোটেই। আজ গৃহে ফিরে কি সংবর্ধনা যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে সেই চিন্তাতেই আকুল তিনি। ক্ষোভে দুঃখে নিজের স্বল্পাবশিষ্ট চুলগুলি উপড়োতে সাধ যায় তাঁর।

গত পঁচিশ বছর যাবৎ একসঙ্গে ঘর করে গৃহিনীকে হাড়ে হাড়ে চিনেছেন তিনি। কাজেই কালকের বিশেষ তিথিটি স্মরণ করে উনি যে নগেন্দ্রনাথের এই অনিচ্ছাকৃত সামান্য ভুলটি এ যাত্রা মার্জনা করবেন এমন আজগুবি আশা মুহূর্তেকের জন্যে মনে স্থান দেন না নগেন্দ্রনাথ। সুনন্দার চোখে তাঁর কোনও ত্রুটি বিচ্যুতিই সামান্য বা অনিচ্ছাকৃত নয়। বরং আগে ভাগে আঁট ঘাট বেঁধে সুনন্দাকে অপদস্থ করার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। পঁচিশ বছর ধরে, সেই বিয়ের দিনটি থেকে, সুনন্দা হাড়-মাস কালি করে স্বামী-সংসারের কল্যাণের জন্যে খেটে মরছেন কিন্তু পরিবর্তে স্বামী কোনদিন কড়ে আঙুলটি নেড়ে সাহায্য বা সহানুভূতি প্রদান দূরে থাক আগাগোড়া বাগড়া দিয়ে এসেছেন পদে পদে।

রিসেপশনিস্ট শ্রীমতী রাজাম্মা চাবির গোছা হাতে সামনে দিয়ে ঘুরে গেল বার দুই। নগেন্দ্রনাথ গাত্রোত্থান করলেই দরজায় তালা এঁটে বাড়ি যেতে পারে সে। বয়স হয়েছে। দু'বার বাস বদল করে, শেষের কিছুটা পথ হাঁটা পথে পাড়ি দিয়ে বাড়ি পৌঁছতে হ'বে তাকে। কাজেই রওনা দেবার জন্যে ছটফট করছে।

নগেন্দ্রনাথ বললেন, "আমার একটু দেরী হ'বে। তালা আমি বন্ধ

করে দেবো'খন, তুমি যাও।"

বুড়ির তোবড়ানো মুখে কৃতজ্ঞতার ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো। মান্ধাতার আমলের পুরোনো ছাতা বগলে গুঁজে হাতে হাতব্যাগ ঝুলিয়ে রাস্তায় নামলো রাজাম্মা এবং খানিক পরেই নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। রাজাম্মার গমন পথের দিকে চেয়ে নগেন্দ্রনাথের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠলো। বুড়ির বাড়ি অবধি না হোক রাজাজী নগর অবধি রোজ অনায়াসে ড্রপ করে দিতে পারেন তাকে কারণ ফিরতি পথে রাজাজী নগর হয়েই যেতে হয় নগেন্দ্রনাথকে। কিন্তু সুনন্দা কর্মচারীর জন্যে স্বামীর এত মাথাব্যাথা পছন্দ করেন না এবং পছন্দ যে করেন না সে কথা বহুবার জানিয়ে দিয়েছেন দ্বিধাহীন মুক্ত বচনে। অবশ্য রাজাম্মাকে এমনিতে পছন্দ করেন সুনন্দা। বলতে কি সুনন্দার পছন্দেই চাকরিতে বহাল হয়েছে সে, কার্যক্ষম কমবুড়ো আরও অনেক প্রার্থীকে টপকে।

নগেন্দ্রনাথ প্রথমটা এই নড়বড়ে বুড়িকে রাখতে চাননি কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন এ কারণে যে তাঁর সত্যি কোনও উপায়ান্তর ছিল না। এর আগে নিজের পছন্দমত যে ক'জনকে রেখেছিলেন সুনন্দা অচিরেই তাদের হটিয়ে দিয়েছেন, নগেন্দ্রনাথকেই বাধ্য করেছেন তাদের হটাতে। নিত্য সেই অশান্তি ও লজ্জাকর পরিস্থিতি আর সইতে পারেন নি। ভেবেছেন এর থেকে আগাগোড়া সুনন্দার মতে চলাই শ্রেয়। অন্তত পশ্চাদপসরণের লজ্জা থেকে বাঁচবেন। ক্রমে ক্রমে নিজের পছন্দ-অপছন্দ মতামত ইচ্ছা-অনিচ্ছা কখন খসে পড়েছে ব্যাঙাচির লেজের মত। শুধু চিহ্নটুকু রয়ে গেছে পাবদা মাছ ভক্ষণের রিচুয়্যাল অবলম্বন করে ----।

হলদে বাড়িটার সামনে এখনও জটলা বেঁধে ভিড় করে আছে কৌতূহলী পথচারী ও পাড়াপ্রতিবেশীর দল। মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে তবে গান বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। এতক্ষণ নিজের চিন্তা এবং দুশ্চিন্তায় ডুবে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ তাই আগে খেয়াল করেন নি। এখন দেখলেন হলদে বাড়ির সামনে জনকোলাহলের রূপ পালটে গেছে সহসা। ঢোলকটা ছিটকে পড়েছে, বাদক কাৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। এতক্ষণ যারা নাচ গান করছিল তারা হতবুদ্ধি হয়ে লোকটাকে ঘিরে তার শুশ্রূষার চেষ্টা করছে। বাদকটি এদের সবার থেকে একটু স্বতন্ত্র। ফর্সা ধবধবে রঙ, বেয়াড়া রকমের দীর্ঘ দেহ। সোনালী চুলের বেনী পথের

ধূলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। পরনে রাজস্থানীদের মত আয়না-খচিত ঘাগরা ও নাতিদীর্ঘ চোলি। সঙ্গী সাথীরা মিলে তাকে টেনে তুললো। তারপর পাঁজাকোলা করে রাস্তার এপারে নিয়ে এলো নগেন্দ্রনাথের চেম্বারে।

এ পর্যন্ত মেয়ে পুরুষ অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা করেছেন নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু মেয়েও নয় পুরুষও নয় এমন রোগীর সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ এই প্রথম। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর কাছে সামনের মানুষটির একমাত্র পরিচয় সে রোগী, চিকিৎসকের সাহায্যপ্রার্থী। এবং সেই হিসেবে তাঁর অন্যান্য রোগীদের সমগোত্র। অল্প কথায় প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিয়ে ক্ষিপ্র হাতে তাকে পরীক্ষা করলেন। তারপর গম্ভীর, চিন্তিত মুখে রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করতে গিয়ে কি ভেবে থামলেন।

জমকালো শাড়ি পরা নেতা গোছের লোকটির দিকে চেয়ে বললেন, "একে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে না গেলে বাঁচানো যাবে না। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস ফাটো ফাটো। আমি অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ফোন করে দিচ্ছি। হাসপাতালের ডাক্তারকেও বলে দিচ্ছি যাতে অযথা দেরী না হয় ----।"

লোকটির চোখে সুর্মা, ঠোঁটে পুরু লিপস্টিক, ভুরুর উপর পেন্সিলের কারচুপি। ভলভলে করে মাখা পাউডার যেন ঝড়ে পড়ছে। কিন্তু খানিক আগের চটুল ভাবভঙ্গি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হাতজোড় করে বললো, "হুজুর ওর যেন প্রাণ বাঁচে আপনি তার ব্যবস্থা করুন। আপনি এত বড় ডাক্তার, আপনি যে রকম বলবেন তাই করবো আমরা। খরচ পত্তর যা হয় আমরা দেবো তার জন্যে চিন্তা নেই। শুধু আমাদের সাথী যেন এ যাত্রা বেঁচে যায় ----।"

হাসপাতালে সকলেই নগেন্দ্রনাথের চেনা জানা। কিছুক্ষণের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। ওঁর বিশিষ্ট বন্ধু এক ডাক্তারের নামে একটা চিরকুট লিখে শাড়ি-ধারিণীর হাতে দিয়ে দিলেন। ওরা চলে গেলে উনিও চেম্বারে তালা মেরে বেরিয়ে পড়লেন ----।

মাসখানেক পরের আর একটি বিকেল। রুগী দেখা শেষ করে গড়িমসি করছেন নগেন্দ্রনাথ। আজ রাজাম্মাও নেই যে বারে বারে উঁকি

ঝুঁকি মেরে আকারে ইঙ্গিতে বাড়ি যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেবে। ইদানীং বাত ও হাঁপানি নিয়ে বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছে বুড়ি। প্রায়ই কামাই করে। নগেন্দ্রনাথ নিরুপায়। একটা ছোকরা গোছের লোক রাখলে এ সব ঝামেলা হয় না কিন্তু সাহস করে মুখ খুলতে পারেন না সুনন্দার কাছে। কে জানে বেশী বললে হয়তো নগেন্দ্রনাথের উপরই ফরমান জারী হ'বে চেম্বার তুলে দেওয়ার। সারাজীবন প্রবাসে কাটিয়ে আজকাল সুনন্দা ঘুরে ফিরে কোলকাতার কথা বলেন খালি আর নগেন্দ্রনাথ ভিতর ভিতর ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন এই বুঝি ডেরা ডাণ্ডা তুলে কোলকাতা রওনা দেবার অর্ডার হ'ল। অনেক ছেড়েছেন, অনেক হারিয়েছেন। তবু যতক্ষণ চেম্বারে থাকেন সব অশান্তি ঝড় ঝাপটার নাগালের বাইরে থাকেন। দিবাশেষের এই আশ্রয়টুকু খোয়াতে চান না নগেন্দ্রনাথ। অহর্নিশি খিটিমিটি তর্জন বর্ষণের মোকাবিলা করার মত সামর্থ্য এখন আর নেই তাঁর।

দরজায় টোকা পড়লো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো এক দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ। আজ পরনে পুরুষের পোষাক। চুল ছোট করে ছাঁটা। এ যে সেদিনকার সেই ঢোলক-বাদক বুঝতে বেশ খানিক সময় লাগলো নগেন্দ্রনাথের। লোকটি হাত বাড়িয়ে তাঁর করমর্দন করলো।

তারপর ইংরিজীতে বললো, "আমার নাম চার্লস্ ডায়ানা ডিক্সন।"

ইংরিজীতে দু'টো করে নাম থাকে অনেকের, আগেও শুনেছেন নগেন্দ্রনাথ কিন্তু তাবলে একসঙ্গে চার্লস্ ডায়ানা ! লোকটি বোধহয় তাঁর বিস্ময় লক্ষ্য করলো।

বললো, "এক কালে আমার নাম ছিল শুধু চার্লস্ ডিক্সন, তারপর নাম হল ডায়ানা ডিক্সন। এখন চার্লস্ ডায়ানা ডিক্সন।"

নগেন্দ্রনাথ হতভম্ব হয়ে বললেন, "তার মানে?"

ডিক্সন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নগেন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে দিল এবং তিনি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলে বললো, "ডু ইউ মাইণ্ড ইফ আই স্মোক?"

নগেন্দ্রনাথ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "আরে না না, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও।"

লোকটি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে বলতে শুরু করলো, "আজ আমায় দেখে তুমি কি ভাবছো জানি না। আমি কিন্তু একদিন তোমারই মত স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীন পুরুষ ছিলাম। পুরুষ হয়েই জন্মেছিলাম এবং সেজন্যে মনে মনে গর্বের অন্ত ছিল না। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি পুরুষের শৌর্য-বীর্য-কীর্তিকলাপের নানা ইতিকথা। মাউন্ট এভারেস্টের চুড়ো থেকে সমুদ্রের অতল পর্যন্ত তাবৎ দুনিয়াতে জয় জয়কার তার। মনে হত জগতের কর্মক্ষেত্র উদগ্রীব হয়ে আমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। আমার ঝাঁপিয়ে পড়ার, হাত বাড়িয়ে সারা সংসার মুঠোয় আনার ওয়াস্তা শুধু। বই মুখে করে বসে বসে সময় ও জীবনের অপচয় করতে চাইনি। তাই সোজা সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়লাম। বাল্যসঙ্গিনী জ্যানেটকেও বিয়ে করে ফেললাম সেই সঙ্গে।

"ছোটবেলায় বেলুন ফুলিয়েছ কখনো? মুখ দিয়ে হাওয়া ভরে একটু একটু করে বড় হয়ে কি অপরূপ রূপই না ধরে। তারপর ভটাস করে ফেটে নেতিয়ে পড়ে থাকে ছিন্ন, নগন্য রবারের কুচি। আমারও তাই হ'ল। বাইশ বছর ধরে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বানানো অহং-এর রঙীন ফানুস অচিরেই ভটাস হয়ে গেল। সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈনিকের জীবনে অহং এর স্থান নেই। আদান-প্রদানের এক প্রান্তে আমি, অন্য প্রান্তে সমস্ত এসটাব্লিশ্মেণ্ট। আমার প্রান্ত থেকে অহর্নিশি কুর্নিশ প্রদান আর ও প্রান্ত থেকে শুধু হুকুম, হুকুম আর হুকুম এবং পান থেকে চুনটি খসলেই ডাণ্ডা।

"অনেক কায়দা করে কাঠ খড় পুড়িয়ে তিন বছরের মাথায় কোনমতে ছাড়ান পেয়ে বাড়ি ফিরলাম। ওরে বাপ ! যেন কড়াই থেকে একেবারে অগ্নি জঠরে প্রবেশ করলাম। শ্রীমতী জ্যানেট তিন বছরে তিনটে বাচ্চা বিইয়ে খাণ্ডারনীর মূর্তি তখন। উঠতে বসতে আমার উপর ঝাল ঝাড়ে, পারলে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেয় আমার। হন্যে হয়ে ঘুরছি চাকরির আশায়। কিন্তু চাকরির ল্যাঠা অনেক। আমার পছন্দ মত চাকরি হ'লে হ'বে না। গিন্নীর পছন্দ মত হওয়া চাই। এরই মধ্যে, একটা জুতোর ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন দিব্যি ছিলাম। মাইনে ভাল, বন্ধু বান্ধবও জুটেছিল। হঠাৎ শুনলাম জ্যানেটের ইচ্ছে আমি ও কাজ ছেড়ে জামাকাপড়ের দোকানে কাজ নিই। দ্যাখো দিকি আবদার ! বাপু চাকরি তো তুই করছিস না, করছি আমি। সারা হপ্তা খেটে খুটে হপ্তাশেষে

মাইনের কড়ি গুণে হিসেব করে হাতে তুলে দিই। সামান্য হাতখরচের জন্যেও কত কৈফিয়ৎ, কত কাকুতি মিনতি। তবু গিন্নী তুষ্ট নয়, বলে এ চাকরি চলবে না, অন্য চাকরি নিতে হ'বে। এদিকে নিজে চাকরি করবে না, বলে সংসার দেখবে কে।

"সংসারের কাজও অধিকাংশই এই শর্মার ঘাড়ে ----। কয়েক বছর এই ভাবে কাটলো। গিন্নীর অত্যাচার বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। এই সময় কাগজে পড়লাম আমাদেরই শহরে এক ট্রাক ড্রাইভার নাকি চিকিৎসা করে মেয়ে হয়ে গেছে। প্যান্ট ছেড়ে স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গায়ে ফুঁ দিয়ে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক পুরোনো সহকর্মীর ঘাড়ে চেপে দিব্যি খাচ্ছে বসে বসে। ডাক্তারের নাম ধাম সংগ্রহ করে দেখা করলাম তার সঙ্গে। বললো আমি যদি মেয়ে হতে চাই তবে তাই বানিয়ে দেবে আমায় কিন্তু সেটা বেশ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। আমি তখন একেবারে মরিয়া। সারাজীবন অন্যের জন্যে খেটে মরার থেকে একসঙ্গে থোকে টাকা খরচ করে যদি এ দাসখৎ থেকে মুক্তি পাই তবে তাই সই। জ্যানেটকে লুকিয়ে টাকা জমাতে লাগলাম। এবং নির্ধারিত দিনে বাড়ির বাক্স ভেঙে আমারই উপার্জনের সঞ্চয় পকেটস্থ করে কেটে পড়লাম।

"চিকিৎসা সুরু হ'ল। তিনটে অপারেশন ---- কিছুদিনের ব্যবধান রেখে ---- এবং মহিলাসুলভ মনোভাব আনার জন্যে মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। ডাক্তারের পরামর্শ মত ঠিক করলাম দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে দেশের অন্য কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় আত্মপ্রকাশ করবো। নারী হিসেবে আমার নতুন সত্তা তাহ'লে স্বীকৃতি পাবে সহজে। এই ডাক্তারের এক বন্ধুর নার্সিংহোম ছিল অন্য শহরে। সেখানে ছুটকো কাজের বিনিময়ে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। ক'টা মাস কেটে গেল। কিন্তু ক্রমে সেখানকার ডাক্তার - রুগী - ঠাকুর - চাকর - দারোয়ান নির্বিশেষে সবারই আমার দেহটার প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ দেখা দিল। আমার সঙ্গলাভের জন্যে লালায়িত সবাই। নতুন নতুন মন্দ লাগতো না, যেন নতুন ধরনের খেলা একটা।

"কিন্তু ক্রমে বিরক্তি ধরে গেল। একা মানুষ আর কাহাঁতক পেরে ওঠা যায়। নাওয়া খাওয়া ঘুম মাথায় উঠলো। শেষে একদিন অপারগ হয়ে কেটে পড়লাম সেখান থেকে। নার্সিংহোমের লোকগুলোর যত

দোষই থাক, হাত দরাজ ছিল। তাদের সমবেত উপঢৌকন সম্বল করে একটা বড় শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। কিশোর বয়সে সেখানে আট দশ বছর কেটেছে আমার। তবে এত বছর বাদে এবং আমার বর্তমান অবস্থা - চেহারা - বেশভূষায় কেউ আমায় চিনতে পারবে এমন সম্ভাবনা নেই এই ভেবে নিশ্চিন্ত মনে ট্রেন থেকে নামলাম।

"নেমেই দেখি স্টেশনের দেয়াল জুড়ে বিরাট বিজ্ঞাপন ---- 'হে নারীগন ! এখন থেকে দেশরক্ষার কাজে তোমরা পুরুষদের সমান অংশীদার। এসো এই পূণ্য কার্যে যোগ দাও কাতারে কাতারে।' সেই সঙ্গে খাকি সামরিক পোষাকে মেয়েদের ছবি। সারবন্দী হয়ে কুচকাওয়াজ করছে। অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলাম। কিছুই বোধগম্য হ'ল না।

একটি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মহাশয়া, ওই বিজ্ঞাপনটা কিসের?'

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বললো, 'আপনি কি বিদেশিনী? নতুন এদেশে এসেছেন? জানেন না সেনাবাহিনীর সব বিভাগের দরজা খুলে গেছে মেয়েদের জন্যে?'

বললাম, 'আপনিও কি ----?'

মহিলা সঙ্কুচিত কণ্ঠে বললো, 'না না, আমি অত ভাগ্যবতী নই। আমার চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারলাম না। তবে আমিও একেবারে অপ্রয়োজনীয় নই। আমি ট্রেনের টিকিট চেকার।'

'আপনার ছেলেমেয়েদের কে দেখে?'

'কে আবার দেখবে? আমিই দেখি। সকালে ওদের খাইয়ে দাইয়ে তৈরী করে নার্সারি স্কুলে দিয়ে আসি। দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার ছুটি পাই এক ঘণ্টা। বাচ্চাদের স্কুলেও তখনি ছুটি হয়। ওদের একটা ডে-কেয়ার সেণ্টারে পৌঁছে দিয়ে আবার কাজে ফিরে যাই। বিকেলে ছুটি হ'লে বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি গিয়ে রান্নাবান্না ও বাড়ির অন্যান্য কাজকর্ম করি। রবিবারে সারা হপ্তার কাচা-কাচি, বাড়ি ঘর ঝাড়াপোঁছা, সেলাই - ফোঁড়াই - রিপুর কাজ, বাজার-ঘাট এই সব করি।'

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো, 'ইস্‌ দেরী হয়ে গেল। ছোট মেয়েটাকে ডেণ্টিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে আবার ----।'

মহিলা হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো আর আমি স্টেশনের কাছেই একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়লাম।

"ক্রমে ক্রমে অনেক কিছুই মালুম হ'ল। এতদিন উটপাখির মত নিজের পক্ষপুটে মুখ গুঁজে পড়ে ছিলাম তাই দুনিয়ার হালচাল যে বদলে গেছে তা চোখে পড়ে নি। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝলাম নিজের বোকামি। আবারও কড়াই থেকে লাফ দিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডেই পতন হ'ল আমার। আমি যে জীবন কল্পনা করে নারীজন্ম বেছে নিয়েছিলাম সে জীবন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশ্বের নারীজাতি প্রগতির পথে এগিয়ে গেছে বহুদূর। এখন এই স্ত্রীস্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে ডায়ানা ডিক্সন ও চার্লস্ ডিক্সনের জীবনযাত্রায় প্রভেদ হ'ল ---- সাদা ভাষায় যাকে বলে বিষ্ঠার এ পিঠ আর ও পিঠ। হায়রে, শুধু এরই জন্যে এত কাঠখড় পোড়ালাম আমি ----। এখন উপায়? আবার আমার পুরোনো শহরে ফিরে গেলাম। চেনা পরিচিতের নজর এড়িয়ে গোপনে হাজির হ'লাম এই খোদকারীর কারিগর ডাক্তারের কাছে। ভদ্রলোক ছেঁদো কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় করার মতলবে ছিলেন।

বললেন, 'এখন আর কিছু করার নেই। ছেলে থেকে কেটে ছেঁটে মেয়ে বানালাম। আবার যদি ছেলে হ'তে চাও সে বাপু বড়ই ঝামেলার কাজ। তাছাড়া এত ঘন ঘন ভূমিকা পাল্টালে শেষে হয়তো সব কিছু গুলিয়ে গিয়ে মাথার গোলমাল হয়ে যাবে তোমার।'

বললাম, 'ছেলে হ'তেও চাইনে আর। গত আটাশ বছর ধরে যা ভোগান্তি ভুগেছি, আর সাধ নেই ----।'

'তবে কি চাও?'

চোখ মুছে বললাম, 'আমার মৃত্যু ছাড়া আর কোনও পথ নেই। আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন। শুধু দেখবেন যেন বেশী কষ্ট না পাই।'

ডাক্তারের মায়া হ'ল।

বললো, 'অত ঘাবড়িও না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

তারপর একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে ইঙ্গিতে কি যেন নির্দেশ দিলেন। লোকটা আমায় সঙ্গে করে অনেক গলি ঘুঁজি পেরিয়ে মাটির নীচে বেসমেণ্টে একটা ঘরে নিয়ে গেল। আমায় চেয়ারে বসিয়ে আমার হাতে একটা অ্যালবাম গুঁজে দিল। অবাক হয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম।

ততক্ষণে সেই লোকটা একটা প্রজেক্টর এনে খাড়া করেছে।

সামনে ছোট একটা স্ক্রীনের উপর আলো ফেলে বললো, 'এবার ওদিকে দেখুন ----।'

"স্ক্রীনের পর্দায় অ্যালবামের ছবির চেহারাগুলো সচল সবাক হ'ল। একদল মানুষের জীবন যাত্রার ছবি। নাচ - গান - বাজনা, হৈ-হুল্লোড়, আমোদ প্রমোদ। নাচে ছন্দ-তালের কড়াক্কড়ি নেই, গানে নেই তান লয়ের গিটকিরি, বাজনা মানে শুধু প্যাঁ - পোঁ কিংবা দুম্ - দুম্ - দুম্ আওয়াজ। লেখাপড়ার চাপ নেই, সামরিক জীবনের জব্বর শৃঙ্খলা নেই। গিন্নীর মুখ-ঝামটা, বাচ্চার ট্যাঁ-ফোঁ, বাচ্চা-বিয়োনোর ঝক্কি, পুরুষ-নেকড়ের লোভানি, কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই। পর্দার পাতে ছবির পাশে পাশে বড় বড় হরফে ফুটে ওঠে ---- 'পৃথিবীতে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে সে এখানে, সে এখানে, সে এখানে।'

"এর পর দেখা যায় আট দশটি একক ছবি, নীচে তাদের পরিচয় লেখা। কেউ বিখ্যাত পাইলট, কেউ কোটিপতি, কেউ উকিল, কেউ বৈজ্ঞানিক। এদের মধ্যে কয়েকজনের নামের সঙ্গে সুপরিচিত আমি, খবরের কাগজে ছবি দেখে দেখে মুখচেনাও। এরা প্রত্যেকে আশ্চর্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোনও হদিশ মেলেনি আর, লাশও পাওয়া যায়নি কোনদিন। আজ জানলাম এদের ধরে নিয়ে যায়নি কেউ, গুমখুনও করেনি। এরা সকলেই স্বেচ্ছায় নতুন জীবন বেছে নিয়ে দূরে সরে গেছে তাদের পুরোনো গতানুগতিক জীবনযাত্রাকে পদাঘাত করে ----। ছবি দেখানো শেষ হ'লে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। দেখি ডাক্তার কখন পাশে এসে বসেছে।

"সেই দিনই নতুন চিকিৎসা শুরু হ'ল। এবার একেবারে নিখরচায়। শুনলাম এটা নাকি তার বিবেকের কাছে ঋণশোধ। সেই ডাক্তারেরই ব্যবস্থায় মাসকয়েক পরে এদেশে এসে হাজির হ'লাম এবং একটা দলে ভিড়ে গেলাম। সেও বছর খানেক হয়ে গেল। বেশ আছি। দিব্যি খাই দাই দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই আর ঢোলক পিটি ডুম - ডুমা - ডুম।"

লোকটা টেবিলে চাঁটি মেরে মুখে বোল ধরলো,

"টাক ডুমা ডুম্
কাট্ গয়া দুম্
রোনা কেয়া অব
হালুম হুলুম
কঁহা গয়া বহ্
মুঝে ক্যা মালুম।"

নগেন্দ্রনাথ বললেন, "আপনার এখন আর কোনই দুঃখ কষ্ট নেই বলতে চান?"

চার্লস্ ডায়ানা মাথা নেড়ে বললো, "উঁহুঁ, কিচ্ছু দুঃখ কষ্ট নেই আর।"

"ভাল করে ভেবে বলুন।"

ভুরু কুঁচকে খানিক চিন্তা করে বললো, "সাংঘাতিক কোনও ব্যাপার নয় তবে সম্প্রতি একটি ঘটনায় মনে বেশ আঘাত পেয়েছি। হাসপাতালে বেয়াক্কেলে সিস্টার কখন চুলে কাঁচি চালিয়ে দিয়েছে আমার অজ্ঞাতে এবং অজ্ঞান অবস্থায়। আগের মতন লম্বা চুল গজাতে সময় লাগবে ঢের। হ্যাঁ, আর একটা দুঃখ বলতে পারেন সে আমার এই হাইটের জন্যে। পছন্দ মত একখানা শাড়িও কি ছাই পরবার জো আছে ! দু'একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু ঢ্যাঙা মানুষকে অপারেশন করে খাটো করার উপায় নাকি তাদের জানা নেই। এ ছাড়া অন্য কোনও অভিযোগ নেই আমার।"

চার্লস্ ডায়ানা উঠে দাঁড়ালো।

হাত বাড়িয়ে নগেন্দ্রনাথের করমর্দন করে বললো, "সেদিন আপনি আমার যে উপকার করেছেন তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার সাথী লতিফ লায়লা আসছিল আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। কিন্তু আমি বললাম আমি নিজে গিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আসবো। আচ্ছা বন্ধু, চললাম। বিদায় ----।"

চার্লস্ ডায়ানা দরজার বাইরে চলে গেল। ওর ঢ্যাঙা শরীরটা রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যেতেই তড়াক করে চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠলেন

নগেন্দ্রনাথ। ওঁর আচমকা ধাক্কায় উল্টে পড়লো চেয়ারটা।

সেদিকে দৃকপাত না করে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় নামলেন তিনি এবং চার্লস্ ডায়ানার গমন পথ লক্ষ্য করে দৌড়তে দৌড়তে চেঁচাতে লাগলেন, "দাঁড়াও! দাঁড়াও! যেওনা। সেই ডাক্তারের নাম ঠিকানা বলে যাও। আমায় পৌঁছে দাও তাঁর কাছে। প্লীজ! তোমায় একান্ত অনুরোধ করছি আমায় ফেলে রেখে যেও না ----।"

এরপর ডাক্তার নগেন্দ্রনাথকে তাঁর চেনা মহলে আর কোনদিন দেখেনি কেউ। কাগজে কাগজে তাঁর ছবি ছেপেছে, পুলিশ তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছে তাঁকে। ক্রমশ বৃহত্তর অঙ্ক ঘোষিত হয়েছে পুরস্কার রূপে। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ তাঁর পরিচিত পৃথিবী থেকে রহস্যজনক ভাবে উপে গেছেন চিরদিনের মত।